# অদম্য

অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এর
একটি প্রকাশনা

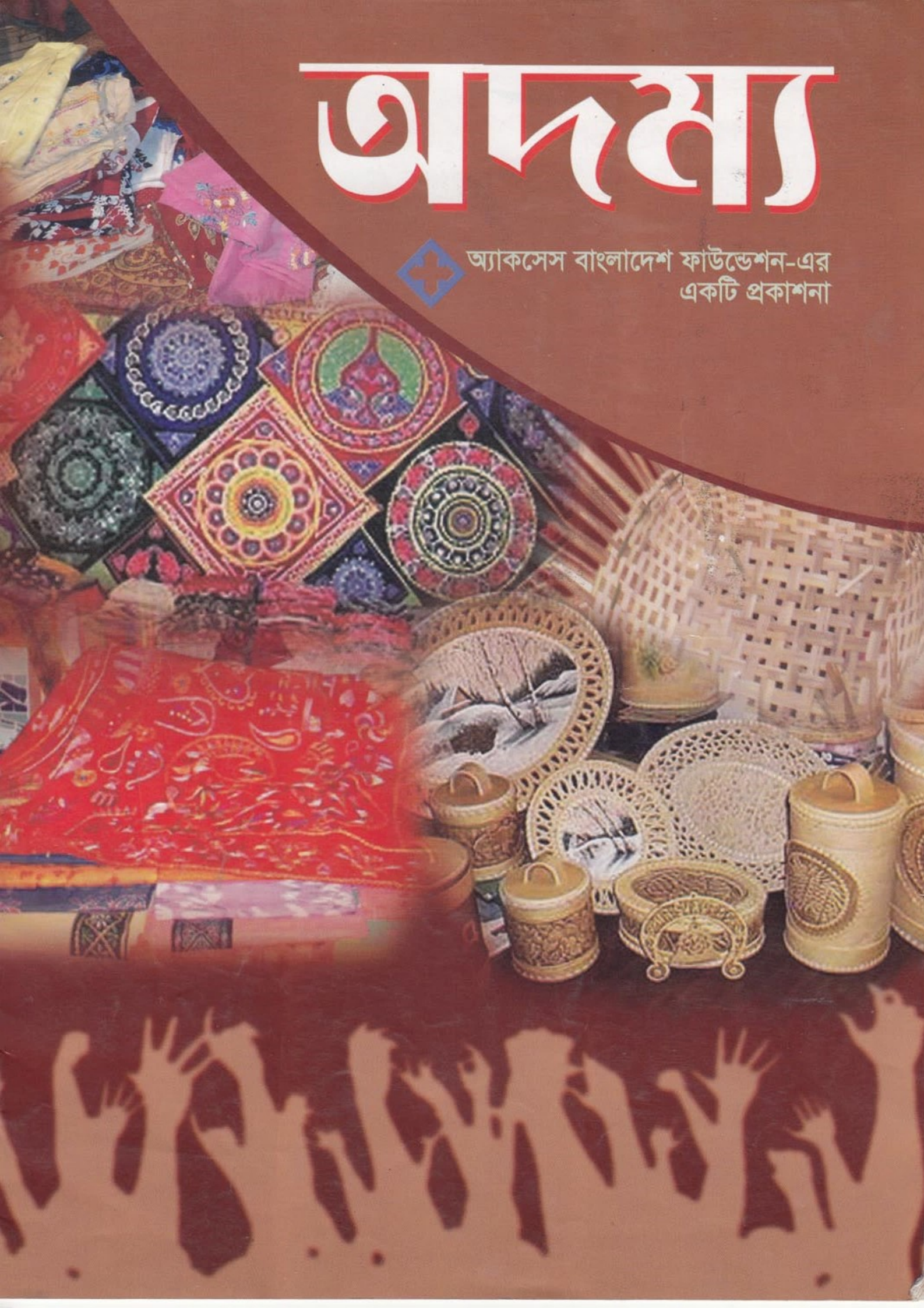

# 'অ্যাকসেস বাংলাদেশ-একশনএইড বাংলাদেশ সম্মাননা ২০১২'

সবচেয়ে সফল প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
**নার্গিস আক্তার শরীফা**

## সফল প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ফেরদৌসী আরা লাকী

হাসি খাতুন

## প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

শাহনারা বেগম

মদন মুখী চাকমা

আগস্তিনা মূর্মূ

রোজিনা আক্তার

হাসিনা আক্তার কেয়া

মোসলিমা খাতুন বানী

জেসমিন আক্তার

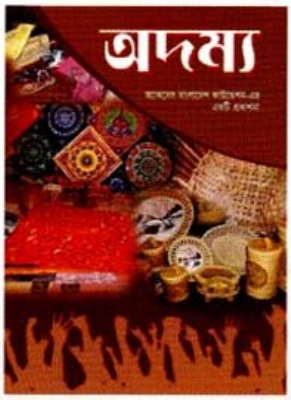


সম্পাদনা পরিষদ

**আলবার্ট মোল্লা**
**কাজী রোজী**
**সুখদেব সানা**
**মহুয়া পাল**
**তস্‌লিম জাহান বীথি**
**ডা. লিনা ফ্লোরেন্স কর্মকার**

সহযোগিতা

**শাহীনুর ইসলাম**
**শেখ সুলতান**

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক ডিজাইন

**মো. ফখরুল ইসলাম**

ফটোগ্রাফি

**সৈয়দা মাহমুদা ইফফাত**

প্রকাশনায়

**অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন**
১০ তারাপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০।
ফোন: ৭৭৪৩১৪৫ ফ্যাক্স: ৭৭৪৩৪৮০
ই-মেইল: info@accessbangladesh.org
ওয়েব : www.accessbangladesh.org



# অদম্য কথা

অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে ২০০৮ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এ সংস্থার অন্যতম বিশেষ দিক হলো–প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ। প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগটিও এ ধারণার বাইরে নয়।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নারীরা কঠোর পরিশ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছেন; যে খবর অনেকেরই অজানা। মনে হয়েছে–এ সকল নারীকে সামনে আনার কাজটি তেমন হয়ে ওঠেনি। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহীত এ ধরনের উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করায় প্রয়াসী হয় অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন। বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের সক্ষমতা ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার প্রভূত উন্নয়ন সাধনে কর্মসূচি গ্রহণ করে সংস্থাটি। ২০১১ সালের শেষের দিকে একশনএইড বাংলাদেশ-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। বিষয় ছিল–প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে দেশে প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করা। একশনএইড বাংলাদেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। আমরা উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাই। উদ্যোগটি হলো ২০১২ সালে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ৩ জন সফল প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তাকে বাছাই করে সম্মাননা প্রদান। পুরস্কার হিসেবে সবচেয়ে সফল উদ্যোক্তাকে ৫০ হাজার টাকা এবং অন্য ২ জন বিজয়ীর প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা, পদক ও সনদ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হলো।

শুরু হলো প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সন্ধান। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। প্রতিবন্ধী বিষয়ক সংগঠনের মাধ্যমেও জানানো হলো। পাওয়া গেল ১৬ জন সাহসী প্রতিবন্ধী সংগ্রামী নারী। যারা জীবনযুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধকতা জয় করেছেন। অতঃপর চূড়ান্ত বিজয়ী নির্বাচনের সবচেয়ে কঠিন কাজটি করতে হয় দুটি প্যানেলকে। প্রথম প্যানেল ১৬ জনের মধ্য থেকে ১০ জনকে বাছাই করে। এরপর নির্বাচিতদের কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনে যাওয়া হয়–রাঙ্গামাটির মদন মুখী চাকমা, সীতাকুণ্ডের শাহনারা বেগম ও জেসমিন আক্তার, রাজশাহীর নার্গিস আক্তার শরীফা, রোজিনা আক্তার ও আগস্তিনা মূর্মূ, বগুড়ার হাসি খাতুন ও ফেরদৌসী আরা লাকী, কুষ্টিয়ার মোসলিমা খাতুন বানী এবং ঢাকার হাসিনা আক্তার কেয়ার বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে। সবশেষে দূরূহ দায়িত্ব পালন করতে হয় চূড়ান্ত প্যানেলকে–শীর্ষ ৩ উদ্যোক্তা বাছাই।

অবশেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন ৩ জন। রাজশাহীর নার্গিস, বগুড়ার লাকী ও হাসি। এরা অদম্য সাহসী, যাদের কোনভাবেই হার মানাতে পারেনি প্রতিবন্ধিতা। নিজেদেরকে সফল উদ্যোক্তাদের কাতারে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় আমাদের সম্মিলিত আন্তরিক সাহস ওদেরকে অদম্যের সারিতে নিয়ে যাবে। আমরা ওদের সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করি।

আজ ১৮ জুলাই ২০১২ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনে জাতীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো ৩ জন প্রতিবন্ধী নারীকে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা জানানো হচ্ছে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে। এছাড়াও প্রথম প্যানেলকর্তৃক বাছাইকৃত অন্য ৭ জনকেও উদ্যোক্তা সম্মাননা জানানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে এরা সবাই আরো উৎসাহিত হবে। বাংলার প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতিষ্ঠিত হতে অনুপ্রাণিতও করবে।

আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি–বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রসার ঘটাতে এ কর্মসূচি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

**আলবার্ট মোল্লা**
নির্বাহী পরিচালক
অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

**এনামূল হক মোস্তফা শহীদ,** এমপি
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও একশনএইড বাংলাদেশ যৌথভাবে সফল প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগ দেশে প্রতিবন্ধী নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করলে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেগবান হবে।

আমি 'অ্যাকসেস বাংলাদেশ-একশনএইড বাংলাদেশ সম্মাননা ২০১২' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

এনামূল হক মোস্তফা শহীদ, এমপি

**সি এম তোফায়েল সামি**
চেয়ারপারসন
অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

# বাণী

প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও একশনএইড বাংলাদেশ–এর যৌথ উদ্যোগে আজ যে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে, তাতে আমি খুবই আনন্দিত। এ উদ্যোগ প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণসহ অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে। এ বছর যারা 'অ্যাকসেস বাংলাদেশ-একশনএইড বাংলাদেশ সম্মাননা ২০১২' পাচ্ছেন তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এগিয়ে আসা তথা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি।

এই উদ্যোগকে সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন–তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

**সি এম তোফায়েল সামি**

# ‘অ্যাকসেস বাংলাদেশ-একশনএইড বাংলাদেশ সম্মাননা ২০১২’-এর বাছাই প্রক্রিয়া

## প্রাথমিক প্যানেল

**মহুয়া পাল,** অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

**তসলিম জাহান বীথি,** অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

**আফরিনা বিনতে এ আশরাফ,** একশনএইড বাংলাদেশ

**জাহিদুল কবীর,** জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

**উম্মে কুলসুম রঞ্জনা,** প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ

## চূড়ান্ত প্যানেল

**রোকেয়া আফজাল রহমান,** বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেন এন্টারপ্রেনিউর

**সি এম তোফায়েল সামি,** অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

**তাসমিমা হোসেন,** পাক্ষিক অনন্যা

**আসগর আলী সাবরী,** একশনএইড বাংলাদেশ

**এ এইচ এম নোমান খান,** সিডিডি

**রিনা রায়,** মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

**ডা. নাফিসুর রহমান,** জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম

**আলবার্ট মোল্লা,** অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

# অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী
# নার্গিস আক্তার শরীফা

রাজশাহীর ঘোড়ামারার রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৮৩ সালে জন্ম নার্গিস আক্তার শরীফার। পিতা শরিফুল ইসলাম; মাতা মসিয়া বেগম। ৩ ভাই ২ বোনের সবার ছোট শরীফা। স্বভাবতই সবচেয়ে আদুরে থাকার কথা তার। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস–আদরের সর্বশেষ সন্তানটির জন্ম হলো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে। তার ওপর দরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী নারীর জন্ম যেন পরিবারের বোঝাকে অনেক বেশি ভারী করে ফেলল।

শৈশবে মা ছাড়া আর কেউ ভালোবাসতো বলে মনে পড়ে না শরীফার। এমনকি খেলার সাথীরাও মেনে নিতে পারতো না। তারা তার পা ধরে টানতো। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতো সে। তবে বিধাতা অন্তত দুই হাঁটু দিয়ে হাঁটা চলার কিছুটা ক্ষমতা দিয়েছিলেন শরীফার। শৈশব থেকেই প্রচণ্ড অভিমানী মেয়েটি। বাবার প্রতিও ছিল অভিমান; ভয়ও। লেখাপড়ার জন্য বই-খাতা কেনার কথা তার মা-ই সাহস করে তার বাবাকে বলতে পারতেন না। পড়ার অদম্য ইচ্ছা থাকায় মাটির বারান্দা, উঠোন কিংবা কখনো বাড়ির পাশের রাস্তায় কাঠি দিয়ে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণমালা লেখা শিখেছিল। এসব দেখে তার মা এক সময় শরীফার বাবাকে বলে কিছু বই-খাতা কিনে দিয়েছিলেন। তবে এবার অন্য রকম বাধ্যবাধকতা। ঘরের বাইরে গেলে বাবা তাকে বকাবকি করতেন। অতঃপর মা তাকে বাবার চোখের আড়ালে রাখার জন্য বাড়ির অদূরে এক হিন্দু পরিবারে সারাদিনের জন্য রেখে আসতেন। রাতে বাড়ি আনতেন। সেই বাড়িতে ছিল 'পদ্মমুনি হস্তশিল্প' নামে একটি কুটির শিল্প ছিল। সেখানে মাটি দিয়ে তৈরি করা হতো বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য ও ঘর সাজানোর শো-পিছ। সেগুলো তৈরি করা দেখে শেখার চেষ্টা করতো শরীফা। এক সময় কিছু কিছু তৈরিও শিখেও ফেলে। সেখান থেকে অল্প পরিমাণ আয় হতো; যা দিয়ে স্কুলে পড়াশোনা শুরু করে। পড়াশুনার ফাঁকে হাতের কাজ যেমন-বিভিন্ন ধরনের সেলাই, কাঠির কাজ, বেতের কাজ, খেজুর পাতার পাটি তৈরি, সুতো দিয়ে জাল বোনাসহ অনেক কাজ শিখে ফেলে শরীফা। এভাবেই কাটে শৈশব।

এতো প্রতিকূলতা কাটিয়েই ১৯৯৮ সালে এসএসসি পাস করে শরীফা। এরপর তার বাবার মনোভাব পরিবর্তন হয়। জন্মের পর থেকেই পিতৃস্নেহ বঞ্চিত প্রতিবন্ধী মেয়েটি

এতোদিনে নিজগুনে অর্জন করে নেয় বাবার পরম স্নেহ, নিরন্তর ভালবাসা। কিন্তু অভিমানি হওয়ায় বাবার এই ভালোবাসাকে সহজভাবে নিতে পারেনি শরীফা। কারণ, তাকে নিয়ে তার বাবার কোন স্বপ্ন ছিলো না। তিনি যেন বাবার একটি অযোগ্য সন্তান! এভাবেই পরিবারে বড় হতে হয়েছে শরীফাকে।

কলেজে ভর্তির আগেই ১৯৯৮ সালে শরীফার বাবা মারা যান। ভাইয়েরা নিজ নিজ পরিবার নিয়ে আলাদা হন। বন্ধ হয়ে যায় শরীফার কলেজে পড়ার স্বপ্ন। তবে এবার শুরু হয় নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন, মাটির কাজ এবং সেলাই মেশিনে ছোট-খাটো সেলাইয়ের কাজ শুরু করে সে। এছাড়াও বসত বাড়ির চারপাশে শাক-সবজি চাষ করতে থাকে। তা দিয়েই কোন রকমে দিন চলে যেতো। এমনিভাবে চলতে চলতে ২০০০ সালে মারা যান শরীফার মা। এবার যেন অথৈ সাগরে হাবুডুবু অবস্থা শরীফার। প্রায় সব হারিয়ে একাকী, নিঃসঙ্গ শরীফার দিন কাটতে থাকে দুঃখ আর সংগ্রামের সাথে।

এতোদিনে বিয়ের বয়স অনেকটা পেরিয়ে একজন পরিপূর্ণ নারী শরীফা। এমন সময় জানতে পারেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সনদ ও ঋণ দেয়া হয়। তিনি সমাজসেবায় যোগাযোগ করে নিজের সম্পর্কে জানান এবং ৫ হাজার টাকা ঋণ পান। তা দিয়ে দু'টি ভালো জাতের ছাগল কিনেন। সেখান থেকে ভালো আয় হতো। তাছাড়া তার মায়ের রেখে যাওয়া দু'টি গাভী ছিল; যা তিনি ছাগল পালন-এর আয় দিয়ে লালন-পালন করতেন। এক সময় একটি গাভীর বাচ্চা হলে বাড়ি বাড়ি দুধ বিক্রি করে আস্তে আস্তে ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। তখন কুটির শিল্পের কাজ ছেড়ে দেন। কারণ, গৃহপালিত পশু পালনের দিকে খুব খেয়াল রাখতে হয়। পাশের ওয়ার্ডের এক প্রতিবেশী বড় ভাই (মুকুল)-এর কাছে জানতে পারেন ADD নামের একটি সংস্থার কথা। যারা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রতিবন্ধী সংগঠন তৈরি করে সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে শেখান। সেখানে গিয়ে সমাজ সচেতনতা, সমাজে মানুষের ভূমিকা, মানবাধিকার, অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন শরীফা। দিবস পালন যেমন-প্রতিবন্ধী দিবসে অংশগ্রহণ বা র‍্যালিতে যোগ দেওয়া, আলোচনা সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কথাগুলো জনগণের কানে পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক, বীমা এমনকি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে সেমিনারে কথা বলা–এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই চলতে থাকে তার দিন। এরই এক পর্যায়ে পরিচয় হয় মো. আব্দুর রহিম (মনা) নামে অত্যন্ত ভাল মনের এক মানুষের সাথে। অতঃপর পরিচয় গড়ায় পরিণয়ে। ২০০৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মনার সাথে শরীফার বিয়ে হয়। তিনি এখন গৃহিণী। ভাবনায় তার একটাই বিষয়–জীবনটা হয়তো এখানেই থেমে যাবে। কিন্তু শরীফা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, তার প্রকৃত স্বপ্নের শুরু এখানেই। স্বামী তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন–ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। মনে ধারণ করা স্বপ্নটাকে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন শরীফা। সেদিন স্বামীকে বলেছিলেন, 'আমি এমন কিছু করতে চাই, যা থেকে অনেক অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আমি নিজেকে একজন প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' স্বামী বলেছিলেন, 'তোমার স্বপ্ন পূরণে সব রকম সহায়তা করব।' এরপর গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সব বিক্রয় করে দেন। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। সঙ্গে স্বামীও কিছু টাকা দেন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি কর্মসংস্থানমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। ২ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে এল,এস কেমিক্যাল কোম্পানি। ২০০৭ সালে লাভ করেন সরকারি অনুমোদন। ট্রেড লাইসেন্স ও প্রিমিসেস লাইসেন্স (সিটি কর্পোরেশন), সিএম লাইসেন্স (বিএসটিআই), ট্রেডমার্ক লাইসেন্স (শিল্প মন্ত্রণালয়) এবং আয়কর ও ভ্যাট (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)সহ মোট ৬টি ব্যবসা সংক্রান্ত নিবন্ধন করেন।

এই উদ্যোগে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল শরীফাকে। ব্যাংক ঋণ নিতে গিয়ে নিজের ভিটা-মাটি, কোম্পানির কাগজপত্র জামানত রাখার কথা বলেও ঋণ পাননি। তবে ব্যাংক ঋণ দেবে না এ কথাও বলেনি। শুধু দেবো, দিচ্ছি, আজ নয় কাল, কাল গেলে বলে পরের সপ্তাহে আসেন–এভাবে সিঁড়ি বেয়ে ব্যাংকের উপর তলায় উঠানামা করতে করতে দুই পায়ের হাঁটুতে ফোসকা পড়ে যেত শরীফার। অবশেষে একদিন ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, 'আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে আসতে হবে না। যখন আমরা ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করব–নিজেরাই ডেকে দেবো। আপনি এই ২০ টাকা রিকশা ভাড়া নিয়ে যান।' কর্মকর্তার ওই আচরণে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন শরীফা। শুধু তাই নয়, তার গর্ভের প্রথম সন্তানটিও গর্ভে মারা গিয়েছিল ব্যাংকের সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করতে করতে। সেই থেকে আজো তিনি কোনো সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

আরেকটি কষ্টের কথা। ট্রেড লাইসেন্স করতে গিয়ে অফিসের সামনে এক ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে আসেন। ভিখারী মনে করে সাহায্য দিতে যান। সেদিনও তিনি যে কষ্ট পেয়েছিলেন তা কখনো ভুলতে পারেন না। তবুও হাল ছাড়েননি। বারবার চেষ্টা করে সরকারি দপ্তর থেকে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে সীমিত অর্থ দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সহযোগিতা এবং পরামর্শ পেয়েছেন। মালিব নয়, শরীফা প্রথম ব্যবসা শুরু করেন শ্রমিক হয়ে। পণ্য নিয়ে বাজারে বাজারে বিক্রি করতেন। এভাবে দূর-দূরান্তে মার্কেট তৈরি করেন। কখনো ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেননি, করেননি বিলাসিতা। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে মেশিন ক্রয় করেন। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ হয়নি। যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে ব্যবসাটি এগুচ্ছিলো, ঠিক তখনই তার জীবনে নেমে আসে আরেকটি বিপর্যয়।

পারিবারিক রান্না করতে গিয়ে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে গায়ে আগুন লেগে সারা শরীর পুড়ে যায়। তার স্বামী তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঢাকাতে দুই মাস বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এতে তার অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য ADD নিজে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেয়। পুড়ে যাওয়ায় তার বাম হাতটি অকেজো হয়ে যায়। তবু তিনি থেমে যাননি। ডান হাত দিয়েই শুরু করেন নারী উদ্যোক্তার কাজ। কষ্ট করে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন বর্তমান অবস্থার সাথে। এখন বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভাই-বোন তার কারখানায় কাজ করেন। যে পণ্যগুলো উৎপাদন হয়, তা বিক্রয়ের জন্য কিছু মার্কেটিং অফিসার, এরিয়া ম্যানেজার, এস.আর, ডিলার এবং হোম ডেলিভারি ও কিছু সুবিধাবঞ্চিত মহিলা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন।

তাছাড়া অনেক প্রতিবন্ধী ভাই-বোন শরীফার কোম্পানিতে কাজ করেন ও পরামর্শ দেন। তার এ কোম্পানিতে বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে ২০ জন এবং পরোক্ষভাবে ৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন প্রতিবন্ধীও রয়েছে। শরীফার কোম্পানিতে তৈরিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে স্পট ক্রিম, রং ফর্সাকারী ক্রিম, উপটান, লোশন, নেইল পলিশ ইত্যাদি। মাসে গড়ে মোট উৎপাদন ৫০০০ পিস। এ কোম্পানির বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা এবং নীট আয় ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা।

শরীফার ব্যবসার উল্লেখযোগ্য একটি দিক হচ্ছে–প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য থেকে ১ টাকা করে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এই শর্ত সঠিকভাবে পালন করছেন শরীফা। প্রতিবন্ধীদের কোন অনুষ্ঠানে, বিয়ে, শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক উপকরণ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ও সমাজের ঝরে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতেই তার এ উদ্যোগ। তাছাড়া স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে স্বাবলম্বী করতেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন শরীফা। সমাজ উন্নয়নে তিনি আরো যেসব ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন তা হলো- প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ, সেলাই মেশিন বিতরণ, শীত বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধী দিবস পালনে অনুদান, বাল্য বিবাহ বন্ধ, নিজ সংগঠনের ঈদ বস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসার অনুদান প্রদান ইত্যাদি।

অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী অসাধারণ শরীফার আরো একটি গুন বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। অবসর সময়ে লেখালেখি করেন তিনি। খুব ইচ্ছে–গল্প লেখার। লিখতে চান–'পৃথিবীতে এখনো অনেক সৎ মানুষ আছে। যারা মানুষ হয়ে মানুষকে বাঁচতে শেখায়।' কোনদিন যদি সুযোগ হয়, সেই মহান ব্যক্তিদের অবদানের কথা লিখে মানুষের কাছে পৌছে দিতে চান; যারা তাকে তার স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছেন, করছেন। এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিকে কখনো যদি বড় করতে পারেন, তাহলে তার ইচ্ছেগুলোকে বই আকারে মানুষের কাছে পৌছে দিবেন–এই তার সুপ্তবাসনা।

শরীফার কারখানায় তৈরি প্রসাধনী পণ্য

# সংগ্রামের অনন্য প্রতীক
# ফেরদৌসী আরা লাকী

মোছাম্মাৎ ফেরদৌসী আরা লাকী। বগুড়া সদরের ১নং ওয়ার্ডের আটাপাড়ার এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম। জালাল উদ্দিন এবং জয়নব বেগম-এর ৫ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ লাকী। পড়ালেখা শুরু আটাপাড়া সরকারি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় পৌর এলাকার সুবিল উচ্চ বিদ্যালয়ে। অর্থনৈতিক টানা পোড়েনের ভেতর দিয়েও দশম শ্রেণীতে যখন লেখাপড়া করে, তখন বয়স ১৪ বছর। এমতাবস্থায় অপরিণত বয়সেই বগুড়া পৌর এলাকার ৫নং ওয়ার্ড জহুরুল নগরের এক ব্যক্তির সাথে বিয়ের কথা বলেন বাবা-মা। লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল লাকীর। তাই বিয়েতে কোনো মত ছিল না তার। কিন্তু বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন মিলে জোরপূর্বক বিয়ের বন্দোবস্ত করেন।

২০০০ সালে বিয়ে হয়। স্বামীর পেশা–পিকআপ ড্রাইভার। আচার-আচরণ খুবই খারাপ। নেশায় আসক্ত ছিল স্বামী। এ কারণে তার বোনেরা পুলিশেও ধরিয়ে দিয়েছিল এবং ১ মাস জেলে ছিল। বিয়ের সময় ২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও বেশকিছু টাকা যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। তারপরও বিভিন্ন সময়ে লাকীর কাছে যৌতুকের টাকার জন্য আবদার করত এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত স্বামী। এভাবে এক পর্যায়ে ২০০১ সালে এক দুর্ঘটনার জন্ম দেয়। একদিন তার স্বামী দু'তলার ছাদের উপরে লাকীর কাছে অন্যায়ভাবে যৌতুকের টাকা দাবি করে। লাকী অসম্মতি জানালে তাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয় এবং ধান ক্ষেতের পানিতে ৫/৬ বার মুখ চেপে ধরে। এতে লাকীর মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সেদিন প্রাণে বেঁচে গেলেও লাকী হয়ে যান চিরপ্রতিবন্ধী। বগুড়া মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসা করার পরও তার মেরুদণ্ডের ক্ষতের কোনো উন্নতি হয় না। দীর্ঘমেয়াদে ডাক্তারি এবং কবিরাজি চিকিৎসা করার ফলে সামান্য উন্নতি হয়। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে অতিকষ্টে ধীরগতিতে চলাফেরা করেন।

প্রতিবন্ধী হলেও দমে যাওয়ার নয় লাকী। ২০০৬ সালে বগুড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত আটাপাড়া আন্দোলন প্রতিবন্ধী অধিকার সংগঠনে যুক্ত হন। সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেন। ২০০৬ সালে বগুড়া অন্ধ সংস্থার সভাপতি মীর মোরশেদ আলীর সহযোগিতায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ২০০৮ সালে এসএসসি পাশ করেন। ওই বছরই লাকীর বাবা মারা যান। ২০০৯ সালে নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন স্কুল এ্যান্ড কলেজে বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। চলতি ২০১২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষায় অগ্রগতির আনন্দের পাশাপাশি লাকীর দুঃখও যেন নিত্যসঙ্গী। এসএসসি পাশের বছরে হারান বাবাকে; আর এ বছর হারিয়েছেন মাকে।

মায়ের মৃত্যু যেন লাকীকে বড্ড বেশিই বেদনার্ত করছে! স্মৃতিকাতর করছে! ২০০৩ সালে সংস্থার কার্যক্রম ও পড়াশুনার অবসরে দুস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মায়ের কাছ থেকে ৫০০/- টাকা নিয়ে কাগজের ঠোঙ্গা তৈরির উদ্যোগ নেন লাকী। মাত্র ৫ জন নিয়ে যাত্রা শুরু। ২০০৬ সালে এডিডি'র সহযোগিতায় অন্ধ সংস্থার পরিচালনায় আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প থেকে প্রথমে ১ হাজার এবং ৩ মাস পর দেড় হাজার টাকা পান। যা তার ঠোঙ্গা তৈরির ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। বাজার থেকে কাগজ কিনে ঠোঙ্গা তৈরি করে নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে বিক্রি করতে থাকেন। প্রতি মাসে ২০ হাজার পিস ঠোঙ্গা বিক্রি হতো। যা থেকে মাসিক নীট আয় হতো ১ হাজার ৭০০ টাকা। তার এ উদ্যোগে ১৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে ৩ জন প্রতিবন্ধী।

২০০৭ সালে লায়ন্স ক্লাব থেকে সেলাই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১টি সেলাই মেশিন পান লাকী। বর্তমানে ২০ জন দুস্থ, বেকার এবং প্রতিবন্ধী নারীকে ব্লক, বাটিক, কারচুপি ও সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এ কাজে একজন প্রশিক্ষক রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য–এদের স্বাবলম্বী করে তোলা। লাকীর উদ্যোগের অভিনবত্ব হচ্ছে–পড়াশুনা ও ঠোঙ্গা তৈরির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছেন তিনি। বগুড়া অন্ধ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৯ সালে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন লাকী। বর্তমানে অন্ধ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক। যেখান থেকে তার মাসিক উপার্জন ৩ হাজার টাকা। ছোট ভাইয়ের পরিবার ও ছোট বোন নিয়ে ৫ জনের সংসার লাকীর। তার আয় থেকে ছোট বোনের পড়ার খরচ, নিজের পড়ার খরচ চালিয়েও ছোট ভাইকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করছেন। শুরুতে লাকীর চলার পথ ছিল বন্ধুর; পদে পদে ছিল বাধা। আর্থিক সমস্যা, দক্ষ কারিগরের অভাব, বাজারজাতকরণের অসুবিধা, শো-রুমের অভাব, ধর্মীয় কু-সংস্কার ইত্যাদি তাকে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতায় ফেলেছে। তবে সব বাধাকে অতিক্রম করে লাকী আজ সফল এক ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা; পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি; এবং তার আয়ের ওপর পরিবারের সদস্যরা নির্ভরশীল। লাকীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা–ব্যবসাকে উন্নত করা এবং অসহায় মানুষের কল্যাণে একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়া।

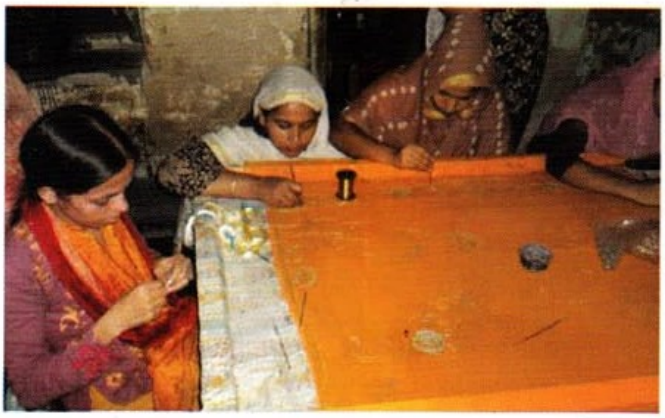

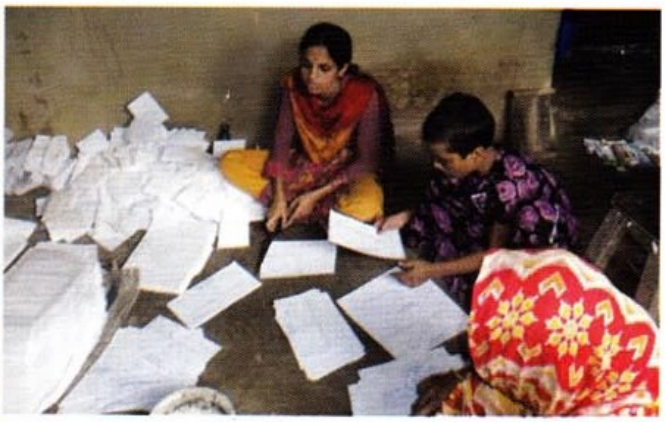

# ট্রেনের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী নারী
# হাসি খাতুন

মোছাম্মাৎ হাসি খাতুন। বয়স ৪২ বছর। পিতা মৃত আফছার আলি মোল্লা, মাতা নুরজাহান বেওয়া। বগুড়ার রহমান নগর গ্রামে জন্ম। ৯ বোন, ২ ভাইয়ের মধ্যে হাসি পঞ্চম। আর্থিক সঙ্কটে লেখাপড়া সম্ভব হয়নি। মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ হয়েছিল।

১৯৮২ সালে হাসির বিয়ে হয় সেনাবাহিনীতে কাজ করা একজনের সাথে। ১৯৮৩ সালে কোল জুড়ে আসে পুত্রসন্তান। তবু তিনি পাননি স্বামীসহ শ্বশুর-শাশুড়ির আদর-যত্ন। খাওয়া-দাওয়ার কষ্টসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো তাকে। স্বামী ঠিকমতো খোঁজ-খবরও নিতেন না। বাধ্য হয়ে ১৪ মাসের সন্তানটিকে কোলে নিয়ে ১৯৮৫ সালে শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসেন রেল স্টেশনে। কিন্তু বিধিবাম। শ্বশুর তার পালানোর কথা জেনে যান এবং পিছু পিছু চলে আসেন স্টেশনে। জীবনের সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে তখন। হাসি খুব দ্রুত চলন্ত ট্রেনে উঠতে গেলে, তার শ্বশুর নাতিকে ধরে টান দেন এবং হাসি পড়ে যান। ট্রেনের চাকার নিচে তার দুই পা চলে যায়। দুর্ঘটনায় তার দু'টি পা কাঁটা পড়ে। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরে সুস্থ হন ঠিকই, তবে হয়ে যান প্রতিবন্ধী। ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার হাসি হয়ে যান মাত্র ৩৪ ইঞ্চি। দুঃখজনক হলো–এতো বড় দুর্ঘটনার পরও চিকিৎসা চলাকালে তার স্বামী কোনো খোঁজ-খবর নেননি। চিকিৎসার পুরো ব্যয়ভার বহন করেন হাসির বাবা।

এরপর শুরু হয় হাসির নতুন জীবন। প্রতিবন্ধিতার জীবন। অল্পদিনেই বুঝতে পারলেন–তিনি পরিবারের একটি বোঝা। বেঁচে থাকার বিকল্প উপায় চিন্তা করলেন। সেলাই শেখার জন্য সারাদিন সূঁচ-সূতা নিয়ে বসে থাকতেন। বিভিন্ন জায়গায় কাজের জন্য গেলেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী হবার কারণে হলেন নিগৃহীত। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা–কোনো কিছু থেকেই পাননি কোনো সহযোগিতা। হাসির বাবা মেয়ের জন্য কিছু জমি রেখে

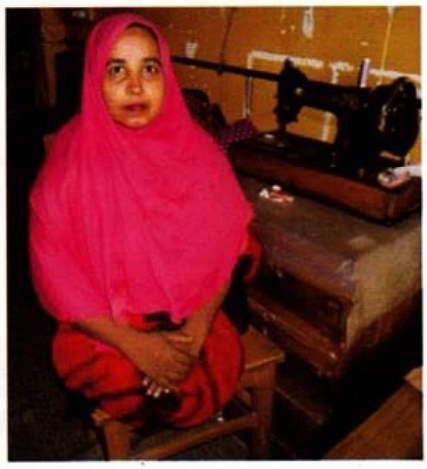

যান। সেখানেই একটি ছোট ঘর ভাড়া করে বয়স্ক প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের সেলাই প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন হাসি। অল্প টাকার বিনিময়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ছোট ছোট সেলাইয়ের কাজ করতে থাকেন। একদিন তিনি বেনু নামে এক প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করেন; যিনি প্রতিবন্ধীদের স্কুলে পড়ান। বেনু হাসিকে দর্জির কাজ শেখান। এরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট অর্ডার পেতে থাকেন। এভাবে ২০০০ সালে ১০ জনকে নিয়ে সেলাই, ব্লক, বাটিক, হস্তশিল্প প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। প্রথমে প্রশিক্ষণের বিনিময়ে কোনো অর্থ না নিলেও, বর্তমানে তার এখানে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- থেকে ১৫০/- দিতে হয়।

আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় খুব অল্প পুঁজি নিয়ে ২০১২ সালে 'ভাই-বোন টেইলার্স' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন হাসি। সেলাই, ব্লক, বাটিক, হস্তশিল্প প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এখানে ১৫ জন বেকার মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জন প্রতিবন্ধী এবং ১১ জন অপ্রতিবন্ধী। মালের অর্ডার নিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়। চাদর, শাড়ি, কুশন কভার, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, টেবিল ম্যাট, ক্রুশের কাজ, বেবি ফ্রক ইত্যাদি তৈরি হয় এখানে। মাসে গড়ে বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা। যা থেকে আয় ৬,৩০০/ টাকা। কাঁচামাল কেনার পর ১,৫০০ টাকা পরিবারে সহযোগিতা করতে পারেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বার্ষিক নীট আয় ৭৫ হাজার ৬০০ টাকা। পারিবারিক শত প্রতিকূলতা জয় করে সমাজে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন ২৭ বছর আগে ট্রেনের নিচে পিষ্ট হওয়া নারী হাসি। নিজেকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত। প্রবল ইচ্ছা-শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে সকল প্রতিবন্ধিতা।

# যেন পরাজয়ে ডরে না বীর
# শাহনারা বেগম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার লালানগর গ্রামের বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের শাহনারা বেগম ৪০ বছরের এক সংগ্রামী নারী। দারিদ্রের কারণে তৃতীয় শ্রেণীর বেশি লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। কোমরের হাড় ক্ষয়ের কারণে প্রায় ৮ বছর ধরে প্রতিবন্ধিতার শিকার। প্রতিবন্ধী নারী হওয়ায় জীবনে নেমে আসে হাজার রকম সমস্যা। এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী মারা যাবার পর বিপদ পরিণত হয় মহাবিপদে। তারপরও সকল সমস্যা পিছনে ফেলে বাঁশ ও বেতের কাজকেই অগ্রাধিকার দেন শাহানারা। প্রথমে তার ভাইয়ের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা এবং স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। এ কাজে তার বার্ষিক মোট বিক্রির পরিমাণ ৬০ হাজার টাকা। আর বার্ষিক নীট আয় ২৪ হাজার টাকা। ব্যবসাকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে কর্মী ৩ জন। এদের ১ জন প্রতিবন্ধী এবং ২ জন অপ্রতিবন্ধী।

২ কন্যা সন্তানের জননী শাহানারা। ১ কন্যা বিবাহিত। অন্যজন ব্যবসায়ে সহযোগিতা করে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এলাকার ১৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়ে 'লালানগর প্রতিবন্ধী সংগঠন' নামে একটি সংগঠন গঠন করেছেন শাহানারা। সংগঠনের সভাপতি তিনি। সংগঠনের সকল সদস্য যেন বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা পায়-সে লক্ষ্যেই কাজ করছেন শাহানারা। এছাড়া তিনি সীতাকুণ্ড প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভর সংগঠনসমূহের ফেডারেশনেরও সদস্য।

তবে এলাকার অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাঁশ ও বেতের কাজ করে সরাসরি বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারলেও প্রতিবন্ধী শাহানারার পক্ষে তা দূরূহ।

এছাড়া একজন দরিদ্র প্রতিবন্ধী নারী হওয়ায় অর্থাভাবে উদ্যোগ পুরোপুরি সফল করা কষ্টকর হচ্ছে তার পক্ষে। প্রয়োজনীয় বাঁশ, বেত ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারছেন না। এতে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে জিনিসপত্র তৈরিও সম্ভব হচ্ছে না। যা তার ব্যবসাকে আরো সফল করার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। তবে এ বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য আত্মপ্রত্যয় রয়েছে শাহানারার। প্রত্যাশা শুধু-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা।

# সামাজিক প্রতিবন্ধিতা-জয়ী
# মদন মূখী চাকমা

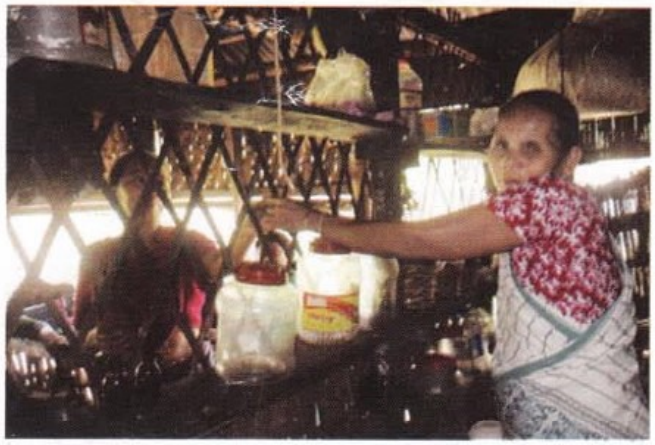

৬০ বছর বয়সী মদন মূখী চাকমার বাড়ি রাঙ্গামাটি সদর জেলার শাপছড়ি গ্রামে। একজন আদিবাসী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারী। ১০ বছর বয়স থেকে তার ১ চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট। অপরটিতেও খুব কম দেখেন। তারপরও থেমে নেই জীবন। প্রতি মুহূর্তে জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন।

আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে স্বামীর ছোট্ট চায়ের দোকানে যখন ২ ছেলে ১ মেয়েসহ ৫ জনের সংসার ভালভাবে চলছিল না, তখন তিনি বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা থেকে উপার্জনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর সেখান থেকেই ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মুদি দোকান শুরু করেন।

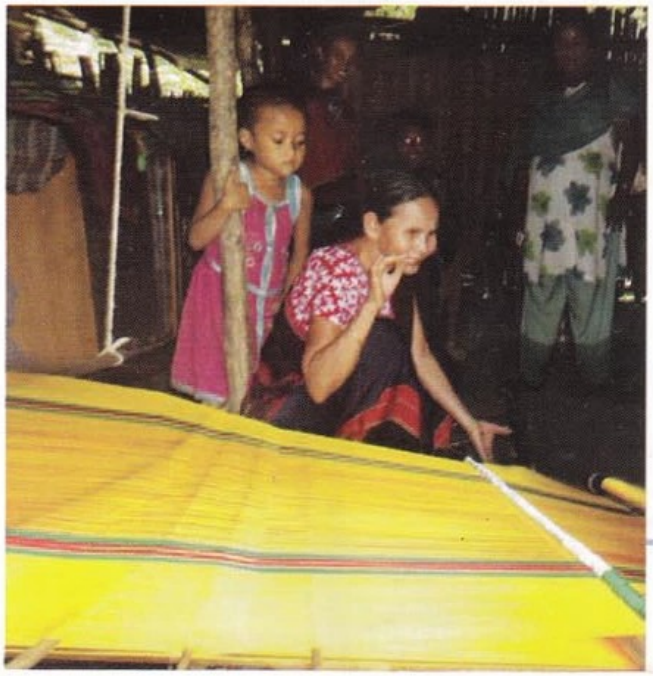

মদন মূখী চাকমা দোকান দিয়েই থেমে থাকেননি। পাশাপাশি তাঁতের কাজও করান। ৫ জন মহিলাকে দিয়ে তিনি তাঁতের কাজ করান। এখন সচ্ছলভাবে সংসার চালাচ্ছেন। এই ৫ জন মহিলার মধ্যে ২ জন প্রতিবন্ধী, ২ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তানের মা এবং ১ জন অপ্রতিবন্ধী।

বর্তমানে মদন মূখী চাকমার দোকান থেকে মাসিক আয় প্রায় ৩ হাজার টাকা। আর তাঁতের কাজ থেকে মাসিক আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় আয় সাড়ে ৫ হাজার টাকা।

এখন মদন মূখী চাকমা ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে ভালো আছেন। তিনি জয় করতে পেরেছেন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। এগিয়ে যেতে চান আরো অনেক দূর। এ কাজে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ ও সহায়তাও প্রত্যাশা করেন তিনি।

# সম্মান নিয়ে বাঁচবেন, বাঁচাবেন
# আগস্তিনা মূর্মূ

১৯৬৭ সালে রাজশাহীর তানোরের মুন্ডুমালা মিশনপাড়ায় জন্ম আগস্তিনা মূর্মূর। জন্মগতভাবেই এক চোখের আলো-বঞ্চিত। সুমি ও হেমরম-এর দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। অতি দরিদ্র আদিবাসী (খ্রিস্টিয়ান) পরিবারে জন্ম। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেয়ায় সমাজের লোকে সন্তানটি মেরে ফেলার জন্য বাবা-মাকে কু-পরামর্শ দিতো। কিন্তু সকলের কথা উপেক্ষা করে বাবা মা তাকে লালন-পালন করেন। শৈশবেই বাবা মারা যান। মা, ভাইসহ নিজে অন্যের জমিতে কামলা খেটে অতিকষ্টে দিন-যাপন করতেন।

সমাজের মানুষ শিশু অবস্থা থেকেই আগস্তিনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ শুরু করে। প্রচার করতে থাকে যে, তিনি তার বাবা-মার পাপের ফসল। সমাজের কুৎসিত আচরণ ও অনাদরে অযত্নে বেড়ে ওঠেন আগস্তিনা। শিক্ষার ছিটেফোঁটাও তার ভাগ্যে জোটেনি। শিশু থেকে নবকিশোরী, কিশোরী থেকে নবযুবতী–এভাবে ক্রমশ যখন পরিণত বয়স্ক আগস্তিনা, তখন সমাজের মানুষের আবারো মাথা ব্যথা। তাকে নিয়ে কাল্পনিক গল্প ফাঁদা শুরু হয়। আগস্তিনা ভবিষ্যতে তার বাবা, মা ও আত্মীয়-স্বজনদের মুখ কলঙ্কিত করবে; কেউ তাকে বিয়ে করবে না। এসব কথার প্রেক্ষিতে তাদের পরিবারে শুরু হয় কলহ-বিবাদ। তবে এসব কথা যখন আগস্তিনার কানে এসে পৌছায়, তখন সে ভাবছিল আত্মহত্যা করবে। ইতিমধ্যে বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী সুরেস মার্ডির সাথে আগস্তিনার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের সময় তার স্বামী প্রায় বেকার বলা চলে। শুধু বর্ষার মৌসুম ছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। তাছাড়া দু'জনই প্রতিবন্ধী হওয়ায় সংসারে আরো দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তাদের সংসারে পরপর দু'টি মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। অভাব-অনটনে, অনাহারে ও অর্ধাহারের মধ্যে দিন যাপন করতে থাকেন তারা। অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন এনজিও'য় ঋণের জন্য যান। কিন্তু কেউ ঋণ দেয়নি। ঋণের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকেও যোগাযোগ করে ব্যর্থ হন। নিরুপায় হয়ে ২০০২ সালে 'মাহালী আদিবাসী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা' (মাসাউস)-এর কাছে কুটির শিল্প হিসাবে বাঁশজাত সামগ্রী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে বাঁশজাত সামগ্রী তৈরি করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু বিধিবাম। উপকরণ ক্রয় ও বিক্রয়ের হিসাব মিলাতে না পারায় তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি আসে আগস্তিনার। সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেয়ানো যায়, তাহলে তাদেরও কর্মসংস্থান হবে; নিজেরও কিছু আয় হবে। শুরু হয় বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম। মাত্র ১৫ জনকে নিয়ে মাসিক ২০/- টাকার বিনিময়ে শুরু করেন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ঝুড়ি, চালুনি, খোলাই ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিজের কর্মসংস্থানের জন্য বাড়িতে বাঁশজাত সামগ্রী তৈরি করে হাটে হাটে বিক্রি করতে থাকেন। এখন তার স্বামীও এ কাজে তাকে সাহায্য করেন। এসব পণ্য বিক্রি বাবদ বার্ষিক ৪৩,২০০/-টাকা পান এবং বার্ষিক নীট লাভ হয় ১২ হাজার টাকা। এসব কাজের পাশাপাশি বর্তমানে আগস্তিনা সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান তথা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। এদের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা সুরক্ষায় প্রতিবন্ধী সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিবারেও এসেছে সচ্ছলতা। বদলে গেছে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও। বর্তমানে সমাজের এক সফল ব্যবসায়ী প্রতিবন্ধী নারী আগস্তিনা মূর্মূ।

# স্বপ্ন যার নেতৃত্বে থাকা
# রোজিনা আক্তার

মো. আব্দুর রশিদ ও হাসনা বেগম-এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মোসাম্মাৎ রোজিনা আক্তার। বাড়ি রাজশাহী শহরের ১৭নং ওয়ার্ডের বড় বনগ্রাম ভাড়ালীপাড়ায়। চার ভাই বোনের সবার ছোট রোজিনা শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। আর দশ জন শিশুর মতোই স্বাভাবিকভাবে জন্ম হয় রোজিনার। ২ বছর বয়সেই হাঁটা শিখে। ৪ বছর বয়সে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে যায়। এরপর ভীষণ জ্বর আসে। ডান পায়ের কুচকিতে একটি বড় ফোঁড়া দেখা দেয়। অসুস্থতা ক্রমশ বেড়ে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। এতকিছুর পরও তার পরিবার সচেতন না হওয়ায়, ভালো ডাক্তার দেখাননি রোজিনাকে। এলাকার একজন সাধারণ ডাক্তারকে দেখালে তিনি একটি ইনজেকশন ও ওষুধ দেন। কিন্তু ভালো হয়ে উঠতে পারেনি সে। ৫/৬ বছর পর্যন্ত হাঁটতে পারেনি। ধীরে ধীরে ৮ বছর বয়সে হাঁটা শিখলেও স্বাভাবিক গতিতে ভালোভাবে হাঁটতে পারে না। ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে বড় হতে থাকে রোজিনা। ৯ বছর বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিবারের অবহেলা আর দারিদ্রতার কারণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেই শিক্ষাজীবনের ইতি টানতে হয়।

২০০১ সালে প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভর সংস্থা (পিএসএস), রাজশাহী এডিডি বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ শুরু করলে সেই সংগঠনের সাথে জড়িত হয় রোজিনা। প্রথমদিকে পরিবার থেকে তাকে সংগঠনে যেতে কিছুটা বাধা দেওয়া হতো। তবে সংস্থার নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে বুঝাতেন। এমনিভাবে এডিডি বাংলাদেশের সহযোগিতায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ নিতে থাকে রোজিনা; এবং বুঝতে থাকে–আর বসে থাকলে চলবে না; কাজ করতে হবে নিজের জন্য এবং তার মতো অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের জন্য। এরপর ২০০৫ সালে ইউসেফ রাজশাহী অফিস থেকে ব্লক বাটিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেয় এবং পরে ব্যবহারিক কাজ শিখে। এরপর বিভিন্ন বুটিক হাউস থেকে হাতের কাজ নিয়ে নিজে করত এবং সংগঠনের মেয়েদের শিখিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারা কাজ করাতো। এমনিভাবে চলল কয়েক বছর।

২০১০ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজ উদ্যোগেই বুটিকের কাজ শুরু করে রোজিনা। প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র নারীদের দ্বারা বিছানার চাঁদর, ওয়ালম্যাট, কুসন কভার, শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়াসহ যাবতীয় পোশাকে কারচুপি ও এ্যাপলিকসহ হাতের কাজ করে বিক্রয় করা ও অর্ডার নেয়া শুরু করে। শুরুতে ১০ জন নারী কাজ করলেও, বর্তমানে ৪০ জন নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার বুটিক হাউসের কাজে জড়িত। পারিবারিক কাজের ফাঁকে এই কাজ করে ৪০ জন নারী আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এদের মধ্যে ১৫ জন প্রতিবন্ধী, ১০ জন প্রতিবন্ধীর অভিভাবক এবং ১৫ জন স্বাভাবিক নারী। অনেকে বুটিক-এর কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার করছেন। অনেকে নিজেদের চাহিদা মিটাতে ব্যয় করছেন। অনেকে আবার সঞ্চয়ও করছেন। পরিবার ও সমাজে এদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা পরিবারে মতামত দিতে পারছেন; পরিবারও তাদের মূল্যায়ন করছে।

এদিকে রোজিনাকে এখন আর পরিবারের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তার উপার্জন দিয়ে নিজের লেখাপড়াসহ সকল চাহিদা মিটিয়ে পরিবারকেও কিছু দিতে পারছে; সঙ্গে সঞ্চয়ও থাকছে। রোজিনা প্রতিমাসে শাড়ি তৈরি করে ১০টি, থ্রিপিস ১৫টি, ফতুয়া ৫টি'র মতো। গড়ে মাসে বিক্রয় হয় ১৫ হাজার টাকা। যাতে নীট লাভ ২,৫০০ টাকা। এই হিসাবে বার্ষিক মোট বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। বার্ষিক নীট আয় ৩০ হাজার টাকা। তবে তার এভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথ সহজ ছিল না। রোজিনা জানায়, মূলধনের অভাব, ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে জমির দলিল/গ্যারান্টার প্রয়োজন হয়। যা প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। তাছাড়া প্রশিক্ষণের সমস্যা, পারিবারিক উৎসাহের অভাব, অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে স্বামীদের অনীহা ইত্যাদি সমস্যাকে জয় করেই এগিয়ে যেতে হয়। রোজিনাও এই ধরনের অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। বুটিকের কাজের পাশাপাশি সংগঠনের সহযোগিতায় রোজিনা পুনরায় লেখাপড়াও শুরু করে। ভর্তি হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ২০১০ সালে এসএসসি পাশ করে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক এ অধ্যয়নরত।

সব কিছুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন রোজিনা। শহর সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহীর সমন্বয় পরিষদের কার্যকরী কমিটির সদস্য তিনি। ২০১১ সালে রাজশাহী জেলার ৫টি উপজেলার ২০টি ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে গঠিত 'প্রতিবন্ধী নারী অধিকার বিকাশ সংস্থা'র কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের নির্বাচনে বিপুল ভোটে সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে ২০১০ সালে প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত সংগঠন প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ)-এর রাজশাহী জেলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এখন তার স্বপ্ন–লেখাপড়ায় এগিয়ে যাওয়া এবং বেশি মূলধন গঠন করে বুটিকের ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত, নির্যাতিত নারীদের অগ্রগতি, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করা।

# এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্নবিলাসী
# হাসিনা আক্তার কেয়া

হাসিনা আক্তার কেয়া। বয়স ৩০ বছর। শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। বাবা মসজিদের ঈমাম; মা গৃহিণী। দুই ভাই চার বোনের সবার বড় কেয়া। সমাজের আর দশজন শিশুর মতোই সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে জন্ম হয় কেয়ার। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতায় ছোট্ট কেয়াকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। কেয়ার বয়স যখন প্রায় ৩ বছর, তখন তার টাইফয়েড জ্বর হয়। জ্বর সারাতে গ্রাম্য কবিরাজ ও হুজুরের কাছে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। পরে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসা করানোর পর তার জ্বর ভালো হয়। বস্তুত, কেয়া পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছিল। এর ফলে তার দুই পায়ের মাংশপেশী কোমর থেকে শুকিয়ে যায়। এরপর থেকে সে লাঠির সাহায্যে কষ্টে চলাফেরা করে।

ছোটবেলা থেকেই কিছু করার ইচ্ছে ছিল কেয়ার। প্রতিবন্ধিতা নিয়েও এক পর্যায়ে ঢাকায় এসে গার্মেন্টস-এ কাজ নেন। ২ বছর কোয়ালিটি ইনচার্জ হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে মায়ের কাছে টেইলারিং-এর কাজ শিখেন। বর্তমানে ব্যবসা করেন কেয়া। পারিবারিক সহযোগিতায় ব্যবসা শুরু করেন তিনি। ঢাকার মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের নিকটে রাস্তার পাশে একটা দোকান দিয়েছেন। মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডেও একটি দোকান আছে। এই দোকান দু'টিতে মূলত কেয়ার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে তৈরি বিভিন্ন জিনিস যেমন-সালোয়ার, কামিজ, বাচ্চাদের কাপড়, বুটিক, জরি, চুমকি এবং সুতায় কাজ করা শাড়ি ও সালোয়ার বিক্রি করে থাকেন। এসব দোকানে গজ কাপড়ও বিক্রি করেন। এছাড়া কেয়া তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে ঠোঙ্গা বা প্যাকেট তৈরি করেন। এগুলো বিভিন্ন শোরুমে সাপ্লাই দেন এবং নিজের দুই দোকানে বিক্রি করেন। তার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৭ জন নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এরা সবাই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ। যেমন প্রতিবন্ধী ১৫ জন। গরীব বিধবা ও হতদরিদ্র ২২ জন। কেয়ার বিভিন্ন ব্যবসা হতে বছরে সব খরচ বাদ দিয়ে গড়ে আনুমানিক লাভ ৩৬ হাজার টাকা। কেয়া তার এই লাভের টাকার বেশিরভাগই ব্যয় করেন সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য। বিশেষত প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য। কেয়া বলেন, 'আমি একজন অবহেলিত প্রতিবন্ধী মানুষ থেকে এই পর্যায়ে এসেছি; আমি জানি-অবহেলিত মানুষের কষ্ট-বেদনা। তাই সব সময়ই তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই।' যেসব প্রতিবন্ধী মানুষের সামর্থ্য নেই চিকিৎসা

করানোর, সহায়ক উপকরণ কেনার, তাদের চিকিৎসা করানোর জন্য অর্থ অনুদানও দেন কেয়া। সহায়ক উপকরণ কেনায় সহযোগিতা করেন। ঈদের দিনে বাসায় ভালো রান্না করার জন্য কেয়া দরিদ্র মানুষদের অর্থ সহায়তা এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নতুন জামা কাপড় কিনে দেন। 'জাগ্রত প্রতিবন্ধী সমাজকল্যাণ সমিতি' নামে একটি সংগঠন গঠন করেছেন কেয়া। যেটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।

কেয়ার আজকের সাফল্যের পিছনে রয়েছে দুঃখ ও বেদনার কথা। ২০০৬ সালে সিএসআইডি এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর সহায়তায় প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে একটি প্রকল্প পরিচালনা করে। সেই প্রকল্পের একজন সার্কেল ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে কাজ করতেন কেয়া। কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি কিছু কাজও শুরু করেন। বিভিন্ন লোকের সাথে যোগাযোগ করা যেমন-কিভাবে কাজ করা যায়, কোথায় কোথায় তৈরি পোশাক দেয়া যায় এবং কাদের নিয়ে এই কাজ শুরু করা যায়। এসব কিছু মিলিয়ে কেয়া একদিন মাঠে নেমে পড়েন জীবনযুদ্ধে। দিন যত যাচ্ছে, যেন বেড়ে যাচ্ছে তার জীবনযুদ্ধও। কেয়ার অদম্য চেষ্টা ও মানসিক শক্তি তাকে যেন এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্নবিলাসী তৈরি করেছে। অথচ প্রতিনিয়ত তাকে সহ্য করতে হয়েছে পুলিশের অত্যাচার, চাঁদাবাজদের ধমক, সমাজের বিভিন্ন প্রভাবশালীদের অহেতুক ভয়-ভীতি। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ কেয়ার লক্ষ্য-লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে। কারণ, কেয়া কেবল নিজের কথাই ভাবেন না; ভাবেন সমাজে পিছিয়ে পড়া অন্যদের কথাও। যারা একদিন পাবে তাদের ন্যায্য অধিকার, যোগ্য সম্মান, সম-সুযোগ, কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং নিরাপদ পরিবেশ। কেয়ার বিশ্বাস-তার এই স্বপ্ন পূরণ করতে হলে কাজ করতে হবে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের নিয়ে। আর তা যে শুধু সরকারি বা বেসরকারি সংগঠনই করবে তা নয়, ব্যক্তি এবং পরিবার পর্যায় থেকেও শুরু করা দরকার। তাই কেয়া নিজে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার পরিবারের সবাইকেও তার ইচ্ছার কথা যুক্তি দিয়ে বুঝাতে সক্ষম হন। এক পর্যায়ে তারা কেয়াকে এই কাজের জন্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। কেয়া বলেন, তার মা-ই তার বড় বন্ধু। মায়ের জন্যই কেয়ার এই এগিয়ে চলা।

# দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের উৎসাহে ধন্য
# মোসলিমা খাতুন বানী

বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করবে; জীবনে অনেক বড় হবে; এমনই এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছিল বানীর জীবন। ৬ ভাই-বোনের সবার বড় মোছাম্মাৎ মোসলিমা খাতুন বানী। জন্ম ১৯৬৯ সালে কুষ্টিয়ার বাড়াদিতে। ১৯৮৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। হঠাৎ পিঠে প্রচ ব্যথা অনুভব হয়। কুষ্টিয়ার কোনো ডাক্তার রোগ ধরতে পারলেন না। কোনরকম পরীক্ষা শেষ করার চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত একটা পরীক্ষা বাকি থাকতেই ঢাকায় নিয়ে গেলেন বাবা। প্রায় ৬ মাস ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডা. রশীদ উদ্দিন বানীর মেরুদণ্ডে র হাড়ে ফাটল দেখতে পান। জানা গেল–৩ বছর বয়সে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়েছিল বানী। সেই চোট রয়ে গেছে। এবার ডাক্তার অপারেশন করলেন। প্রথম অপারেশন সফল হলো না। তিন মাস পর আবার অপারেশন। এরপর ১৯৮৭ সালে সিআরপি'র ফার্মগেট সেন্টারে পাঠানো হয়। সেখানে রোগীর সাথে কোনো লোক থাকার নিয়ম ছিল না। তাই ৭ দিন পর ডা. রহমান-এর ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায় বানী। তবে পর ডা. রহমান-এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। মা-বাবা, ভাই-বোনসহ বাড়ির সবার আন্তরিক সেবা-যত্নে নতুন জীবন ফিরে পেল বানী; কিন্তু হাঁটতে পারতো না। ডাক্তারের পাশাপাশি তার মা নিয়মিত ফিজিওথেরাপি দিতেন। বানীর মা হোমিও ডাক্তার। ফিজিওথেরাপির পর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে।

পুরো সুস্থ করার লক্ষ্যে বানীকে ১৯৯৪-৯৫ সালে সাভার সিআরপি'তে ভর্তি করা হয়। প্রায় চার মাস ছিলেন সেখানে। সিআরপি'তে দ্বিতীয়বার ভর্তির পর তার জীবনটাই বদলে গেল। সেখানে যেসব রোগী ছিল, তাদের

মধ্যে বানীর শারীরিক অবস্থা অনেক ভালো। এসব রোগী দেখে তার মনোবল অনেক বেড়ে গেল। নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন বানী। ছোট ভাই-বোনেদের নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছেন বানী। তাই ভেবেছিলেন ভাই-বোনেরা তার দায়িত্ব নিবে। কিন্তু বাস্তব অনেক কঠিন। বানীর বাবা-মা দু'জনই বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবক হিসেবে কুষ্টিয়াতে তারা সুপরিচিত। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদ এবং বেগম জোহরা তাজউদ্দিন ছিলেন বানীর বাবা-মার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বেগম জোহরা তাজউদ্দিন বানীর মাকে আপন ছোট বোনের মতো স্নেহ করেন। তার মায়ের নকশী কাঁথার প্রকল্প ছিল। কুষ্টিয়া মহিলা কল্যাণ সমিতি তার বাবা-মার হাতে তৈরি। যার উদ্বোধন করেন জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদ। এই সমিতি এতোই সুনামের সাথে পরিচালিত হয় যে, তৎকালিন সরকার এটাকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে। বানীর অসুখের পর মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নকশী কাঁথার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মার কাছ থেকে তার ছোটবেলায় সূঁই সূতার হাতেখড়ি। নিজের জামা-কাপড় ও ভাই-বোনেদের জামাকাপড়ে বিভিন্ন নকশা এঁকে সেলাই করতেন বানী। জোহরা তাজউদ্দিন ও তার মেজ মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি দেশের বাইরে গেলে, বানীর জন্য সব সময়ই কিছু না কিছু উপহার আনতেন। বানী ভাবলেন, তাঁকে কিছু দেয়া উচিত। নিজের হাতে সেলাই করে একসেট কুশন কভার উপহার দেন বানী। তার হাতের কাজ দেখে সিমিন হোসেন রিমি খুবই খুশি হন। বানীকে উৎসাহিত করেন নকশী কাঁথার ব্যবসা করতে। এবং বানীর তৈরি সকল জিনিস বিক্রয়ের দায়িত্ব নেন রিমি। ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ২০ হাজার টাকাও দেন। সময়টা ছিল ২০০৪ সাল। সেই থেকে বানীর ব্যবসা শুরু। বানী নকশা করে মেয়েদের দিয়ে সেলাই করে রিমির কাছে পাঠিয়ে দেন। আর রিমি তাকে টাকা পাঠিয়ে দেন। প্রায় ৪০ জন মেয়ে বানীর এই কাজে যুক্ত। এদের ৩ জন প্রতিবন্ধী মেয়ে। নকশী কাঁথা, বিছানার চাদর, কুশন কভার, ওয়াল ম্যাট, জায়নামাজ ইত্যাদিতে নকশা করে মেয়েদের কাছে দিয়ে দেন। মেয়েরা ঘরে বসে কাজ করে। কারণ অধিকাংশ মেয়ে সমাজের দরিদ্র পরিবারের। তারা সংসারের ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে। এদের মধ্যে কিছু স্কুল-কলেজেও পড়ে। বানীর ভালো লাগে এই দেখে যে, সমাজের কিছু নারীকে কাজে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন তিনি। বানীর কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় অনেক সময় লাগে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চাদর সেলাই করতে ২ মাস এবং নকশী কাঁথা ৩ থেকে ৬ মাস লাগে।

২০০৯ সালে আকস্মিক বানীর বাবা মারা যান। এবার তার জীবনই যেনো ওলোট-পালোট হয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। নানা অসুখ বাসা বাঁধে শরীরে। মনের জোর কমে যেতে থাকে। এক সময় কাজ করতেন সময় কাটানোর জন্য। এখন করেন সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য। এখন চারিদিকে তাকালে মনে হয়–তার পৃথিবীতে মা ছাড়া কেউ নেই। সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছেন বানী। মাসে গড়ে বিক্রি ৩০ হাজার টাকা। লাভ ৫ হাজার টাকা। বছরে প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকার মাল বিক্রি করেন বানী। যার নীট বার্ষিক আয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। তার পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা সবই শ্রদ্ধেয় সিমিন হোসেন রিমি। নতুন জীবনের ঠিকানা দেখিয়ে দেবার জন্য সিমিন হোসেন-এর প্রতি চির কৃতজ্ঞ বানী।

# লক্ষ্য তার এগিয়ে যাওয়া
# জেসমিন আক্তার

জেসমিন আক্তার ৪০ বছরের একজন প্রতিবন্ধী নারী। মাত্র ৫ দিন বয়সে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হন। প্রতিবন্ধিতা ও দারিদ্রের কারণে লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার ভায়েরখীল গ্রামের বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নে তার জন্ম। প্রতিবন্ধী নারী হিসাবে তার জীবনে নেমে আসে হাজার রকম সমস্যা। তারপরও সকল সমস্যাকে পিছনে ফেলে সিমেন্টের বস্তা দিয়ে ব্যাগ তৈরি ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। এ কাজকেই তিনি সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেন। তার মাসে উৎপাদন ২৮০০ ব্যাগ। এ কাজে বার্ষিক মোট বিক্রির পরিমাণ প্রায় ১ লাখ টাকা। বার্ষিক নীট আয় প্রায় ৩০ হাজার টাকা। এই ব্যবসাকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে তাকে যারা সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করছেন তারা হলেন স্বামী, মেয়ে ও প্রতিবেশী একজন নারী।

জেসমিন তার এলাকার ১৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়ে ২০০২ সালে 'ভায়েরখীল প্রতিবন্ধী সংগঠন' নামে ১টি সংগঠন গঠন করেছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনের সভাপতি। সংগঠনের ৫ জন সদস্যদের জন্য সরকারি প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলন করেছেন। ২০১০ সাল থেকে সীতাকুণ্ড প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভর সংগঠনসমূহের ফেডারেশনের নারী বিষয়ক

সম্পাদক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি তার এলাকায় সরকারি কোনো বিদ্যালয় না থাকায় গত ৭ বছর যাবৎ তার সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ইপসা'র সহযোগিতায় একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। এছাড়া এলাকার দরিদ্র নারীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। জেসমিন ব্যাগ তৈরির পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করেন। তার বর্তমানে ১২টি হাঁস ও ১৭টি মুরগি রয়েছে। হাঁস ও মুরগির ডিম বাজারে বিক্রি করার পাশাপাশি হাঁস-মুরগি বিক্রি করেও সংসারের সংস্থান করেন।

জেসমিন এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে সিমেন্ট-এর ব্যাগ সংগ্রহ করে বাজারের থলে তৈরি করেন। যা সংগ্রহ করতে তার জন্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তবে দরিদ্র প্রতিবন্ধী নারী হওয়ায় অর্থাভাবে প্রয়োজন অনুসারে সিমেন্টের ব্যাগসহ অন্যান্য সামগ্রী সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারেন না। যা তার ব্যবসাকে সফল করার জন্য অনেক বড় বাধা। তবু প্রতিদিন ব্যবসাকে বড় করার অদম্য চেষ্টা এবং চিন্তায় মগ্ন জেসমিন এগিয়েই চলেছেন...।